ইতিকথা ত্রয়ী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭২

ইতিকথা ত্রয়ী

পুতুলনাচের ইতিকথা
শহরবাসের ইতিকথা
ইতিকথার পরের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

© সতীর্থ প্রকাশনা

প্রথম মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০২৩
প্রচ্ছদ: পরাগ ওয়াহিদ
সমন্বয়ক: আবু আনন্দ নিটু
বানান সংশোধন: আবু আনন্দ নিটু ও তাহমিদ রহমান
কম্পোজ: মোসাদ্দেক হোসেন প্রান্ত ও রুকাইয়া সুলতানা ঋতু
অক্ষরসজ্জা: তাহমিদ রহমান

সতীর্থ প্রকাশনা' র পক্ষে ১০/ক, জেলা পরিষদ মার্কেট (নানকিং দরবার হলের সামনে), মনিবাজার, রাজশাহী ৬০০০; যোগাযোগ: ০১৭৩৭৭২৪১৭০ থেকে **মো. তাহমিদুর রহমান** কর্তৃক প্রকাশিত এবং রংধনু অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত; যোগাযোগ: ০১৭৩০-৯১৯৭৭৭

বাংলাবাজার শাখা:
দোকান নং – ১১৭,
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: সাতশত টাকা মাত্র
Price: 700TK | INR: 650 ₹ | USD: $25

Itikotha Trilogy by **Manik Bandopadhyay**
Published by **Md. Tahmidur Rahman**, **Satirtho Prokashona**,
10/ka, Zila Porishod Market, Monibazar, Rajshahi
Published: Nov. 2023
ISBN: 978-984-97205-9-1

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঐতিহ্য, ভূমিপ্রকাশ, চিরকুট প্রকাশনী, নয়া উদ্যোগ, সফা প্রকাশনী, রেঁনেসা, বাতিঘর, নটিলাস, সূর্যোদয় প্রকাশন, বেনজিন প্রকাশনী, শিরোনাম প্রকাশনী, উপকথা, কবি, চন্দ্রভূক, অ্যাডর্ন-সহ যে সকল প্রকাশনা সংস্থা বাংলা চিরায়ত বইসমূহ প্রকাশ করেছে;

বুক স্ট্রিট, বিবিধ, বুক হারবার, ধী বুকশপ, অনুস্বর, বাংলাবাজার বুকস, পড়ুয়া বুকশপ, বইনগর, বুক ওয়ার্ল্ড, বুকলেট.কম, লার্নার, বুক হাট, বুকার্স, ফিবোনাক্কি, ভ্রামণিক, বইবাংলা, বুক ভিলেজ, বুকস অফ বেঙ্গল, নাইন্টি নাইন বুকশপ, বুক ফিয়েস্তা, বুকস্টর্ম-সহ বাংলা চিরায়ত বইসমূহ নিত্যদিন পাঠকদের হাতে স্বল্প দামে তুলে দেওয়া ফেসবুকভিত্তিক সকল বুকশপকে;

বইপোকাদের আড্ডাখানা, থ্রিলার পাঠকদের আসর, বইকথা এক্সপ্রেস, পাঠকের ক্যাফে-সহ সকল ফেসবুকভিত্তিক বইয়ের গ্রুপসমূহ; যাদের কল্যাণে পাঠক নিত্যদিন বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন চিরায়ত বই সম্পর্কে জানতে পারে;

আবুল ফাতাহ মুন্না,
সজল চৌধুরী,
আদনান আহমেদ রিজন,
রিয়াজুল ইসলাম জুলিয়ান,
পরাগ ওয়াহিদ;
রুদ্র কায়সার;
সানজিদা স্বর্ণা
ও
বর্তমান সময়ের সকল নান্দনিক প্রচ্ছদকারগণ;
যাঁদের নান্দনিকতার ছোঁয়াতে চিরায়ত বইসমূহ নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পাচ্ছে–

–তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

সাধারণত এই পৃষ্ঠাতে উৎসর্গপত্র দেওয়া থাকে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাসমূহ সেভাবে কখনই কাউকে উৎসর্গ করেননি বা করে থাকলেও সেই তথ্য অজানাই রয়ে গেছে। তবে বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত বই নিয়ে বর্তমান সময়ে অনেক ধরণের কাজ হচ্ছে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়–যাঁদের মাঝে অন্যতম। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নতুন একটা জোয়ার এসেছে, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত বই নতুনভাবে প্রকাশের। নতুন এই জোয়ার নিয়ে আসা প্রকাশনা সংস্থাসমূহ, এই জোয়ারকে ধরে রাখা বিভিন্ন বুকশপ ও ফেসবুকভিত্তিক বইয়ের গ্রুপ এবং অবশ্যই যাঁদের কল্যাণে এই বইগুলো নতুন আঙ্গিকে পাঠকদের আকর্ষণ করছে–সেই সকল প্রচ্ছদশিল্পীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে সতীর্থ প্রকাশনা। এই বইয়ের এই অংশটি বাংলাদেশের বইপাড়ার বর্তমান সময়কে ধরে রাখা ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামান্য এক প্রয়াস।

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

সূচিপত্র

পুতুলনাচের ইতিকথা: ১১ – ১৮৬
শহরবাসের ইতিকথা: ১৮৭ – ২৮৬
ইতিকথার পরের কথা: ২৮৭ – ৪৪৮

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের নব সৃষ্টির চিরভাস্বর প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষরিক অর্থেই সাহিত্যের মানিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে অত্যুক্তি হয় না। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে রবীন্দ্র-শরৎ ধারা যবে ক্রমে জেঁকে বসেছে সাহিত্য সায়রে সেই লগ্নে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার মতো আবির্ভাব ঘটে মানিকবাবুর। সাহিত্যে রবীন্দ্র ধারাবিরোধী কল্লোলগোষ্ঠী বরাবরই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তৃণমূল জনগোষ্ঠীর দুঃখ, দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে তিনি কমিউনিস্টের আতসীকাচের ওপর থেকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। অঙ্কুরেই বিজ্ঞানের সাহচর্য থাকায় গোঁড়ামি, কুসংস্কারের বলয় থেকে তিনি ছিলেন সদা মুক্ত। পাশাপাশি মার্কসবাদের ছত্রছায়ায় ইয়ুং অ্যাডলার, সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রমুখ এর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রভাবের সংমিশ্রণ, সাহিত্যে তার নিজস্ব ধারা প্রবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

সে ধারার অনন্য রূপায়ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সাহিত্য ইতিকথা ত্রয়ী। পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২) এই তিনটি উপন্যাসকে ত্রয়ী হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এতে অভিন্ন চরিত্রের কোনো উপ্যাখান বর্ণিত হয়নি।

বহুল পঠিত উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা পঠনের পর পাঠকের হৃদয় হয়তো খুঁজবে শশী ডাক্তারকে, চপলা কুসুমকে। তাদের পরিণতিকে। কিন্তু লেখক যেন চেয়েছেন অপূর্ণতার মাঝেই বেঁচে থাকুক পুতুলনাচের পুতুলেরা। তবে তিনি পাঠককে বঞ্চিত করেননি কোনো অংশেই। গ্রামীণ মৃত্তিকার গন্ধ ছেড়ে তিনি পিচঢালা পথের উষ্ণতা ছড়িয়েছেন শহরবাসের ইতিকথায়। সে পথে হেঁটেছে তরুণ মোহন কিন্তু অভিজ্ঞতা বেড়েছে বয়োজেষ্ঠ পীতাম্বরের। চরিত্রসমূহের যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এ খণ্ডে রচিত হয়েছে শহরকাব্য। লেখকের বিচক্ষণ লেখনশৈলীতে উচ্চাভিলাষী মোহনের মাঝে পাঠকের অবচেতন মন খুঁজে নেবে শশী ডাক্তারকে। অন্যদিকে ইতিকথার পরের কথায় বিলেত ফেরত শুভর দৃষ্টিতে গ্রাম ও শহরের মিতালিই যেন চিত্রিত। নন্দ, জগদীশ, লক্ষ্মী এদের মাঝে লেখক কোথাও যেন লুকিয়ে রেখেছেন তার পূর্ববর্তী বইয়ের মনস্তত্ত্ব। তবে ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হবার সুবাদে পুতুলনাচের ইতিকথার তুলনায় শহরবাসের ইতিকথা এবং ইতিকথার পরের কথায় মার্কসবাদের প্রভাব অধিক লক্ষণীয়।

অর্থাৎ এই ত্রয়ী উপন্যাস কোনো চরিত্র নির্ভর ত্রয়ী নয়। বরং এই ত্রয়ী গাঁথা হয়েছে সমাজ ব্যবস্থার সুতোয়, রাজনৈতিক উপাদানে, গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বসঙ্কুল পটভূমিতে যার গিঁটে গিঁটে রয়েছে মানসিক টানাপোড়েন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায় যে, তিনি তার লেখনশৈলীকে নানামাত্রিক পরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করেছেন। এর উদাহরণ হিসেবেও অবতারণা করা যেতে পারে ইতিকথা ত্রয়ীকে। বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা দু'টি অংশ ভাগ করে নিতে পারি

(ক) ভাষারীতি: পুতুলনাচের ইতিকথায় লেখক শুধুমাত্র ক্রিয়াপদে সাধুরীতির প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী দু'টি খণ্ড তিনি রচনা করেছেন চলিত ভাষায়। ভাষা ব্যবহারে এরূপ তারতম্য, পঠন অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্যের সহায়ক।

(খ) চরিত্রসম্ভার: চরিত্র রূপায়নে পুতুলনাচের ইতিকথা বইটি সাম্যাবস্থা বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ব্যপ্তীর নিরিখে রচিত 'শহরবাসের ইতিকথা' বইটিতে চরিত্র বিশ্লেষণ তুলনামূলক কম। এতে বইটির কলেবর ছোট হয়ে আসলেও এর সামাজিক ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ পাঠককে চিন্তার খোরাক যোগাবে। অন্যদিকে তৃতীয় খণ্ড 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাসে লেখক সমাজের নানা স্তরের মানুষের নমুনায়ন ঘটিয়েছেন। প্রায় সিংহভাগ চরিত্রকে তিনি বর্ণনা করেছেন তাদের অতীত হতে ফলে স্বভাবতই এই খন্ডটির পরিসর বিস্তর।

উপন্যাস ত্রয়ী, সচেতন পাঠক সমাজের বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। কেননা এই উপন্যাস তিনটিকে পোষকদেহ বিবেচনা করে লেখক যেন পাঠকের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত। সাহিত্যের মোড়কে তিনি তার দর্শন, বোধ, সামাজ ব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে মিথস্ক্রিয়া সেগুলো তুলে ধরেছেন অবলীলায়। তিনি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন সামাজিক অসংলগ্নতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত, ভাবনার দুয়ারে কড়া নেড়ে যেন ডেকে চলেছেন অবিরাম।

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টিকে নতুন মোড়কে পাঠকের হাতে তুলে দিতেই সতীর্থ প্রকাশনার মহাযজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞের নেপথ্যে সতীর্থ প্রকাশনার সাথে কর্মরত সকল কলাকুশলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রকাশক মো. তাহমিদুর রহমান ভাই-এর প্রতি; কেননা সমন্বয়কের গুরুদায়িত্ব পালনকালে ভাই-এর অনুপ্রেরণা, সাহস এবং সহযোগিতা অনস্বীকার্য। দায়িত্বের মান কতটুকু রাখতে পেরেছি তা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পাঠকের রায়ের অধীন অর্পণ করলাম। ভুল ত্রুটি মার্জনার দরখাস্ত রইল এবং যে কোনো প্রকার গঠনমূলক সমালোচনার জন্য অগ্রীম ধন্যবাদ।

পরিশেষে, মানিকের সাহিত্য সম্ভারে পাঠকের অবগাহন সুখময় হোক এই প্রত্যাশায়–

আবু আনন্দ নিটু
রাজশাহী, ২০২৩

প্রকাশকের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় আঠাশ বছর সাহিত্য সাধনা করেছেন। এর মাঝে তিনি রচনা করেছেন সাঁইত্রিশটি উপন্যাস, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ মিলিয়ে তিন শতাধিক ছোট গল্প, ষোলোটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ, একটি নাটক ও বেশ কিছু কবিতা। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, লেখকের মৃত্যুর প্রায় ছয় দশক পরের পাঠক সমাজ তাঁর খুব সামান্য কিছু লেখার গণ্ডির মাঝেই বিচরণ করে যাচ্ছে। অথচ বিগত কয়েক দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিভিন্ন রচনা পাঠকদের সুবিধার্থে নানান সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই রচনাসমূহের বেশিরভাগই ত্রুটিযুক্ত।

লেখকের রচনাসমূহের সময়কাল বিগত শতাব্দীর বিভিন্ন সময়। যার ফলে বর্তমান সময়ে বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্করণে ক্ষেত্র বিশেষে শব্দ, বাক্য; এমনকি সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত অনুপস্থিত। ইতিকথা ত্রয়ী প্রকাশের কাজ চলাকালীন সময়ে এই বিষয়গুলো সামনে আসলে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রকাশিত পুতুলনাচের ইতিকথা, শহরবাসের ইতিকথা ও ইতিকথার পরের কথা উপন্যাসের বিভিন্ন সংস্করণ সংগ্রহ করা হয়। এর বাইরেও অনলাইন থেকে বিভিন্ন পিডিএফ সংগ্রহ করা হয়; যেগুলোর প্রায় সবই পাঁচ-ছয় দশক আগে বিভিন্ন সময়ের ভারতীয় সংস্করণ। তিনটি বইয়ের প্রতিটির জন্য অন্তত পাঁচ-ছয়টি সংস্করণ সংগ্রহ করে ইতিকথা ত্রয়ীর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়েছে।

শুধুমাত্র শব্দ বা বাক্যের অনুপস্থিতির বিষয়টা নিয়েই যে কাজ করা হয়েছে তা না। প্রচলিত ও পুরানো বেশিরভাগ সংস্করণেই দেখা যায় গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপ কোনো প্রকার যুগল উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন আবদ্ধ নয়। তবে এই সংস্করণে তিনটি উপন্যাসের প্রতিটি সংলাপে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

লেখকের লেখনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাস বা গল্পে তিনি নিজস্ব ঢঙে গল্প বলে গিয়েছেন এবং গল্পের চরিত্র বিভিন্ন সময়ে যে সংলাপ বলেছে তার প্রেক্ষিতে লেখক কিংবা চরিত্রের স্বগোক্তি রয়েছে। উদ্ধৃতি চিহ্ন না থাকার ফলে অনেকক্ষেত্রেই চরিত্রের সংলাপ ও স্বগোক্তি একে অপরের সাথে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। যা এই সংস্করণে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেব বল যায়, পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের একদম শুরুতেই শশী ডাক্তার ও গোবর্ধনের নিচের কথোপকথনের দৃশ্যটি।

> শশী বলিল, "দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।"
>
> গোবর্ধন বলিল, "ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?"
>
> শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গ কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কী বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

এই অংশে লেখক চারিত্রিক স্বগোক্তি (অন্যান্য চরিত্র শুনতে পায় না কিন্তু দর্শক শুনতে পায় এমন উক্তি) বা ভাবনাকে 'শশী ভাবিয়া দেখিল' এর মাধ্যমে সরাসরি চরিত্রের ভাবনা হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ফলে এখানে তেমন একটা সমস্যা না হলেও ঠিক পরের অংশে—

> "আয় তবে, দুজনে ধরেই নামাই। গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাঁধ, সরে গেলে মুশকিল হবে। আচ্ছা, আলোটা আগে জ্বেলে নে গোবর্ধন। অন্ধকার হয়ে এল।"

আলো জ্বালিয়া শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া গোবর্ধন উপরে উঠিয়া গেল। দুজনে ধরাধরি করিয়া হারুকে তাহারা সাবধানে নৌকায় নামাইয়া আনিল। শশী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দে, নৌকা খুলে দে গোবর্ধন। আর দ্যাখ্ ওকে তুই আর ছুঁসনে।"

আবার ছোঁবার দরকার!

—হারুকে নৌকায় নামানোর পরে শশী গোবর্ধনকে নৌকা খুলে দিতে বলে এবং সাথে হারুকে না ছোঁয়ার কথাও বলে। এরপরেই দেখা যাচ্ছে 'আবার ছোঁয়ার দরকার!' বাক্যটি; যা লেখকের নিজস্ব স্বগোক্তি। ঠিক এই ধরনের কিছু বিষয়কে সামনে রেখেই চারিত্রিক সংলাপগুলোতে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেন পাঠক সহজেই চারিত্রিক সংলাপ ও লেখকের বা চারিত্রিক স্বগোক্তিসমূহ বুঝতে পারে।

সাধারণত দেখা যায় চিরায়ত লেখকের কোনো বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলে সম্পাদনা করা হয়; বিশেষত ভারতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রেই এমনটা বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমী ব্যতীত চিরায়ত লেখকের রচনাসমগ্রে সম্পাদনা ও বরেণ্য ব্যক্তিদের বিশাল আলোচনা ও ভূমিকা দেখা যায়। তবে সতীর্থের এই সংস্করণে তেমন কোনো বিষয় রাখা হয়নি। তাই বলে বিশেষ সম্পাদনা যে করা হয়নি, তা কিন্তু না।

লেখকের মূল লেখনীশৈলীতে কোনো প্রকার হাত না দিয়ে বর্তমান বাংলা ব্যকরণের নিয়ম মেনে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহারের মতো করেই সুনির্দিষ্ট কিছু শব্দের প্রচলিত রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, কী এবং কি এর ব্যবহার, বাড়ি বা গাড়ি শব্দের ব্যবহার এর মতো খুব সাধারণ ও প্রচলিত বিষয়গুলো পরিবর্তন করা হয়েছে।

এত কিছুর পরেও যে এই সংস্করণে ভুল নেই, তা কিন্তু বলা যাবে না। তিনটি উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকাল প্রায় ৭০-৮০ বছর পূর্বে। তাই এত চেষ্টার পরেও আমরা ধরে নিচ্ছি এই সংস্করণে কিছু ভুল তো অবশ্যই আছে। তবে পাঠকদের হাতে 'সর্বাপেক্ষা' নির্ভুল একটি সংস্করণ তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সম্পাদনা বিষয়ক কাজ হয়েছে সতীর্থের নিজস্ব সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে। বিশেষ করে আবু আনন্দ নিটু এই পুরো বিষয়টা সমন্বয় করেছেন; যা এই বইটি প্রকাশের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি প্রান্ত ও রিতু এই তিনটি উপন্যাসের কম্পোজের গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। এই প্রক্রিয়াটা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর; ওদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা। প্রচ্ছদকার পরাগ ওয়াহিদকে ধন্যবাদ; বইয়ের এত সুন্দর প্রচ্ছদ করার বাইরেও আলাদাভাবে তিনটি বইয়ের জন্য বিশেষ প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য।

এছাড়াও বরাবরের মতো উল্লাস ও প্রোডাকশন টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রকাশকের কথা অংশে গুরুগম্ভীর কথা লেখার অভ্যেস কখনই ছিল না। আর প্রকাশক হলেও দিনশেষে পাঠক সত্তার কারণেই বই নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তাই পাঠকের জানা জরুরি এমন বিষয়গুলো উল্লেখ না করে পারলাম না।

বন্ধুত্ব হোক বইয়ের সাথে...

মো. তাহমিদুর রহমান
সতীর্থ প্রকাশনা, রাজশাহী।

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,
পুতুলনাচের ইতিকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল! স্থানটিতে ওজনের ঝাঁজালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দিনের আলো বজায় থাকিতে থাকিতে বাজিতপুরের দু-একটি সাহসী পথিক মাঠ ভাঙিয়া আসিয়া ঘাসের নিচে অদৃশ্যপ্রায় পথ-রেখাটির সাহায্যে পথ সংক্ষেপ করে। বলিয়া কহিয়া কারো নৌকায় খাল পার হইলেই গাওদিয়ার সড়ক। গ্রামে পৌঁছিতে আর আধ মাইলও হাঁটিতে হয় না। চণ্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। যামিনী কবিরাজের চেলা সপ্তাহে একটি গুল্মলতা কুড়াইয়া লইয়া যায়। কার্তিক-অঘ্রান মাসে ভিনগাঁয়ের সাপুড়ে কখনো সাপ ধরিতে আসে। আর কেহ ভুলিয়াও এদিকে পা দেয় না।

বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। আকাশের একপ্রান্তে ভীরু লজ্জার মতো একটা রঙের আভাস দেখা দিল। বটগাছের শাখায় পাখিরা উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং কিছুদূরে মাটির গায়ে গর্ত হইতে উই-এর দলকে নবোদ্গত পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবার সেইদিকে উড়িয়া গেল। হারুর স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালিটি একসময় নিচে নামিয়া আসিল। ওদিকে বুঁদি-গাছের জালে একটা গিরগিটি কিছুক্ষণ ধরেই অনেকগুলি পোকা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনে আসিয়া ছপছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বারবার মুখ ফিরিয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!

*

শশী বলিল, "নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন। ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে। এখান দিয়ে নামানো যাবে না।"

বটগাছটার সামনাসামনি খালের পাড় অত্যন্ত ঢালু। বৃষ্টিতে পিছলও হইয়া আছে। গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লইয়া গেল। সাত মাইল তফাতে নদীর জল চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাত বাড়িয়াছে। খালে স্রোতও বড় কম নয়। শ্যাওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, "আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।"

শশী বলিল, "দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।"

গোবর্ধন বলিল, "ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?"

শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গ কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কী বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

"আয় তবে, দুজনে ধরেই নামাই। গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাঁধ, সরে গেলে মুশকিল হবে। আচ্ছা, আলোটা আগে জ্বেলে নে গোবর্ধন। অন্ধকার হয়ে এল।"

আলো জ্বালিয়া শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া গোবর্ধন উপরে উঠিয়া গেল। দুজনে ধরাধরি করিয়া হারুকে তাহারা সাবধানে নৌকায় নামাইয়া আনিল। শশী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দে, নৌকা খুলে দে গোবর্ধন। আর দ্যাখ্ ওকে তুই আর ছুঁসনে।"

আবার ছোঁবার দরকার!

শশী শহর হইতে ফিরিতেছিল। নৌকায় বসিয়াই সে দেখিতে পায়, খালের মনুষ্য-বর্জিত তীরে সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছে ঠেস দিয়া ভূতের মতো একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। পাগল ছাড়া এসময় সাপের রাজ্যে মানুষ ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। শশীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা ছিল না। হাঁকডাক দিয়া সাড়া না পাইয়া গোবর্ধনকে সে নৌকা ভিড়াইতে বলিয়াছিল। গোবর্ধন প্রথমটা রাজি হয় নাই। ওখানে এমন সময় মানুষ আসিবে কোথা হইতে। শশীরও চোখের ভুল। সত্য সত্যই সে যদি কিছু দেখিয়া থাকেও, ওই কিছুটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়া আর কাজ নাই, মানে মানে এবার বাড়ি ফেরাই ভালো। কিন্তু শশী কলকাতার কলেজে পাস করিয়া ডাক্তার হইয়াছে। গোবর্ধনের কোনো আপত্তিই সে কানে তোলে নাই। বলিয়াছিল, "ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাব গোবর্ধন, নৌকা ফেরা।"

তখনো আকাশে আলো ছিল। হারুর চারিপাশে কচুপাতায় আটকানো জলের রুপালি রূপ একেবারে নিভিয়া যায় নাই। কাছে গিয়া হারুকে দেখিবামাত্র শশী চিনিতে পারিয়াছিল।

"ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু! এখানে ও এল কী করে?"

গোবর্ধনের মুখে অনেকক্ষণ কথা সরে নাই। সে সভয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মরে গেছে নাকি ছোটবাবু?"

"মরে গেছে। বাজ পড়েছিল।"

"আহা চুলগুলো বেবাক জ্বলে গেছে গো!"

হারুর বদলে আর কেহ হইলে, যে মানুষটা মরিয়া গিয়াছে তাহার চুলের জন্য গোবর্ধনকে শোক করিতে শুনিয়া শশীর হয়তো হাসি আসিত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে হারুকে এ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। হারুর ছেলেমেয়ে আছে, আত্মীয়বন্ধু আছে, সকলের চোখের আড়ালে একটা গাছের নিচে ওর একা-একা মরিয়া যাওয়া কী শোচনীয় দুর্ঘটনা! গোবর্ধনের কথায় তাহার মন আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল।

গোবর্ধনের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল!

"এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে ছোটবাবু? গাঁয়ে খপর দি গে চলো।"

"এমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যাব গোবর্ধন?"

"তার আর করছ কী?"

"গা থেকে লোকজন নিয়ে ফিরতে ফিরতে শেয়াল যদি টানাটানি আরম্ভ করে দেয়?"

গোবর্ধন শিহরিয়া বলিয়াছিল, "তবে কী করবে ছোটবাবু?"

"হাঁক তো, কেউ যদি আসে।"

কিন্তু এই বাদল-সন্ধ্যায় আশেপাশে কে আছে যে হাঁকিয়ে ছুটিয়া আসিবে? নিজের হাঁক শুনিয়া গোবর্ধন নিজেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। আর কোনো ফল হয় নাই। রসুলপুরের হাটের দিন খালে অনেক নৌকা চলাচল করে। আজ কতক্ষণে আর-একটি নৌকার দেখা মিলিবে, একেবারে মিলিবে কী না, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই।

হারুকে নৌকায় নামাইয়া লওয়ার কথাটা তখন শশীর মনে হয়।

নৌকা খুলিবামাত্র স্রোতের টানে গতিলাভ করিল। গলুই-এর উপর দাঁড়াইয়া লগিটা ঝপ করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া গোবর্ধন হঠাৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা কও ছোটবাবু। উহার মুক্তি নাই তো?"

শশী হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। হাই তুলিয়া বলিল, "কী জানি গোবর্ধন, জানি না।"

তাহার হাই তোলাকে বিরক্তির লক্ষণ মনে করিয়া গোবর্ধন আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

শশী বিরক্ত হয় নাই, অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। হারুর মরণের সংস্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা। মৃত্যু এক-এক জনকে এক-এক ভাবে বিচলিত করে।

আত্মীয় পরের মৃত্যুতে যাহারা মর-মানবের জন্য শোক করে, শশী তাহাদের মতো নয়। একজনকে মরিতে দেখিলে তাহার মনে পড়িয়া যায় না সকলেই একদিন মরিবে—চেনা-অচেনা আপন-পর যে যেখানে আছে প্রত্যেকে—এবং সে নিজেও। শ্মশানে শশীর শ্মশান-বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন। মৃত্যুর সান্নিধ্য এইভাবে এইদিক দিয়া শশীকে ব্যথিত করে।

কিছুদূর সোজা গিয়া গাওদিয়ার প্রান্তভাগ ছুঁইয়া খাল পুবে দিক পরিবর্তন করিয়াছে। বাঁকের মুখে গ্রামের ঘাট। গাওদিয়া ছোট গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বিশেষ ধারে না। ঘাটও

আর কিছুই নয়, কোদাল দিয়া কয়েকটি ধাপ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র! ঘাটের উপরে একটা টিনের চালা আছে। পাটের সময় সেখানে পাট জমাইয়া বাজিতপুরে শশীর ভগ্নীপতি নন্দলালের গুদামে চালান দেওয়া হয়। তিন-চার খেপ চালান গেলেই গাওদিয়ার পাট চালানের পাঠ ওঠে। তারপর সারা বছর চালাটা পড়িয়া থাকে খালি। গোরু, ছাগল, মানুষ—যাহার খুশি ব্যবহার করে, কেহ বারণ করিতে আসে না। চালার সামনেই চণ্ডীর মার ছেলে চণ্ডী সারাদিন একটা কাঠের বাক্সের উপর কয়েক প্যাকেট লাল-নীল কাগজ মোড়া বিড়ি ও রেকাবিতে ভিজা ন্যাকড়ায় ঢাকা কয়েক খিলি পান সাজাইয়া বসিয়া থাকে।

ঘাটে কয়েকটি ছোট বড় নৌকা বাঁধা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিতেও এখন না আছে আলো, না আছে মানুষ।

গোবর্ধনের মনে ভয় ছিল, তাহাকে নৌকায় পাহারা রাখিয়া শশী হয়তো নিজেই গ্রামে যাইতে চাইবে। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াই সে তাই বলিল, "আমি তা হলে গাঁয়ে খপর দিগে ছোটবাবু?"

শশী বলিল, "যা। পা চালিয়ে যাস গোবর্ধন। আগে যাবি গোয়ালাপাড়ায়। নিতাই, সুদেব, বংশী—ওরা সবাই যেন ছুটে চলে আসে। বলিস, আমি অন্ধকারে মড়া আগলে বসে রইলাম। আলোটা তুই নিয়ে যা, যেতে যেতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হবে। পিছল রাস্তা।"

আলো লইয়া গোবর্ধন চলিয়া গেল। এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ খুঁজিলে হয়তো এখনো একটু ধূসর আভা চোখে পড়ে কিন্তু অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শশী ভাবিল, আর পনেরো-বিশ মিনিট দেরি করিয়া বটগাছটার কাছে পৌঁছিলে হারুকে সে ঠাহর করিতে পারিত না। খাল দিয়া যাতায়াত করিবার সময় ভূত ও সাপের রাজ্যটির দিকে সে বরাবর চোখ তুলিয়া তাকায়। আজও তাকাইত। কিন্তু হারুকে তাহার মনে হইত গাছের গুঁড়িরই একটা অংশ। হয়তো মানুষের আকৃতির সঙ্গে গাছের অংশটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আর হারুর পরনের কাপড়ের শ্বেতাভ রহস্যটুকুর মানে না বুঝিয়া তাহার একটু শিহরণ জাগিত মাত্র। হারু ওইখানেই পড়িয়া থাকিত। কতদিন পরে শিয়ালের দাঁত ও শকুনির চঞ্চুতে সাফ-করা তাহার হাড় কয়খানি মানুষ আবিষ্কার করিত কে জানে! পঞ্চকে চণ্ডীর-মা যেমন আবিষ্কার করিয়াছিল। সর্বাঙ্গে খাবলা খাবলা পচা মাংস, কোথাও হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতের মুঠার মধ্যে প্রকাণ্ড খরিস সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।

স্রোতের বেগে নৌকা মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। নৌকার গলুইয়ে সে দোলন একটা জীবন্ত প্রাণের অস্থিরতার মতো পৌঁছিতেছে। নড়িয়া চড়িয়া শশী একসময় সোজা হইয়া বসে। মনে একটা বিড়ি ধরাইবার ইচ্ছা জাগিতেছিল। কিন্তু সেটুকু উৎসাহও সে যেন পায় না। তাহার চোখের সামনে চারিদিক ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। তীরের গাছগুলি জমাটবাঁধা অন্ধকারের রূপ নেয়, জলের উপর জনহীন নৌকা ক'খানা হালকা ছায়ার মতো আলগোছে ভাসিতে থাকে। মাথার উপর দিয়া অদৃশ্যপ্রায় কতগুলি পাখি শাঁ-শাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করিতে আরম্ভ করে।

এত কাছেও হারুর মুখ ঝাপসা হইয়া যায়। তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সে যে মরিয়া গিয়াছে এই সত্যটা শশী যেন আবার নূতন করিয়া অনুভব

করে। ভাবে, মরিবার সময় হারু কী ভাবিতেছিল কে জানে! কোন কল্পনা কোন অনুভূতির মাঝখানে তাহার হঠাৎ ছেদ পড়িয়াছিল?

মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে হারু বাজিতপুরে গিয়াছিল এটা শশী জানিত। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ওই বিপথে সে পাড়ি জমাইয়াছিল। পথ তাহার সংক্ষিপ্তই হইয়া গেল। পাড়িও জমিল ভালোই।

ঘণ্টা দুই পরে গোটা তিনেক লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া হারুর সাত-আট জন স্বজাতি আসিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ ঘাটটি মুহূর্তে হইয়া উঠিল মুখরিত।

শশী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "নিতাই এসেছে, নিতাই?"

নিতাই সাড়া দিল, "আজ্ঞে, এই যে আমি ছোটবাবু।"

নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ। শশী অনেকটা ভরসা পাইল।

"হারুর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে নিতাই?"

"হয়েছে ছোটবাবু।"

আলো উঁচু করিয়া ধরিয়া সকলে তাহারা ভিড় করিয়া হারুকে দেখিতে লাগিল। গোবর্ধনের কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়াছিল। শশীর কাছে আর-একবার শুনিল। তারপর ঘাটের খাঁজের উপর উবু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে শশীর মনে হইল, হারুর পরলোক গমন ওদের কথার মধ্যেই এতক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বর্ষণক্ষান্ত বিষণ্ণ রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রঙিন আলোয় হারুর জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলি যেন দৃশ্যমান ছায়াছবির রূপ গ্রহণ করিয়া চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। হারুর পরিবারের ক্ষতি ও বেদনার প্রকৃতি উপলব্ধি যেন এতক্ষণে শশী আয়ত্ত করিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল, সংসারে হারু যে কতখানি স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছে-এই অশিক্ষিত মানুষগুলির মনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার পরিমাপ সম্ভব। এতক্ষণ হারুর অপমৃত্যুকে সে বুঝিতে পারে নাই। হারুকে সে আপনার জগতে তুলিয়া লাইয়াছিল। সেখানে শূন্য করিয়া রাখিয়া যাওয়ার মতো স্থান হারু কোনোদিন অধিকার করিয়া ছিল কি না সন্দেহ।

নীরবে শশী অনেকক্ষণ তাহাদের আলোচনা কান পাতিয়া শুনিল। শেষে রাত বাড়িয়া যাইতেছে খেয়াল করিয়া বলিল, "তোমরা তাহলে আর বসে থেকো না নিতাই। রসিকবাবুর বাগান থেকে বাঁশ কেটে এনে একটা মাচা বেঁধে ফ্যালো।"

নিতাই প্রশ্ন করিল, "সোজা মশানবিলে নিয়ে যাব কি ছোটবাবু?"

শশী বলিল, "না। ওর বাড়িতে একবার নামাতে হবে।"

হারুকে সোজাসুজি শ্মশানে লইয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা কমিত। কিন্তু হারুর মেয়ে মতির জ্বর। সকালে শ্মশানে আসিলেও সে আসিতে পারিবে না। তাহাকে একবার না দেখাইয়া হারুকে পোড়াইয়া ফেলিবার কথাটা শশী ভাবিতেও পারিতেছিল না। মতির কাছে খবরটা এখন কয়েক দিনের জন্য চাপিয়া যাওয়ার বুদ্ধিও বাড়ির কাহারও হইবে কি না সন্দেহ। মতি জানিতে পারিবে তাহারই জন্য বর খুঁজিতে গিয়া ফিরিবার পথে হারু অপঘাতে প্রাণ দিয়াছে। জ্বর গায়ে এই বর্ষার রাত্রে হয়তো সে শ্মশানে ছুটিয়া আসিবে। জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে আর সকলকেই হয়তো সে ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু

শশীকে সে সহজে মার্জনা করিবে না। বলিবে, "আপনি থাকতে আমাকে একটিবার না দেখিয়ে বাবাকে ওরা পুড়িয়ে ফেলেছিল গো!"

রসিকবাবুর বাগান হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া মাচা বাঁধা হইল। তার পর হারুকে মাচায় শোয়াইয়া হরিবোল দিয়া মাচাটা তাহারা কাঁধে তুলিয়া লইল।

শশী কহিল, "এখন তোমরা হরিবোল দিও না। হারু শ্মশান-যাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।"

কথাটা এমন করিয়া শশী ইচ্ছা করিয়া বলে নাই। নিজের কথায় নিজেরই চোখদুটি তাহার সজল হইয়া উঠিল।

রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা। বর্ষাকালে কোথাও একহাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিছল হইয়া থাকে। গোরুর গাড়ির চাকাতেই রাস্তাটির সর্বনাশ করে সবচেয়ে বেশি। বর্ষার পর কাদা শুকাইয়া মনে হয় আগাগোড়া যেন লাঙল দিয়া চষিয়া ফেলা হইয়াছে। শীত পড়িতে পড়িতে পথটি আবার সমতল হইয়া যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষতের উঁচু সীমানাগুলি গুঁড়া হইয়া এত ধুলা হয় যে পায়ের পাতা ডুবিয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাতাসে ধুলা উড়িয়া দুপাশের গাছগুলিকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

গ্রামে ঢুকিবার আগে খালের সঙ্গে সংযুক্ত নালার উপর একটি পুল পড়ে। পুলের নিচে স্রোতের মুখে জালি পাতিয়া নবীন মাঝি সেই অপরাহ্ণ হইতে বুকজলে দাঁড়াইয়া আছে। নিতাই ডাকিয়া বলে, "কী মাছ পড়ল মাঝি?"

নবীন বলে, "মাছ কোথা ঘোষ মশাই? জল বড় বেশি গো!"

"মাগুর-টাগুর পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।"

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, "জলে দেঁড়িয়ে কি মিছা কথা কইছি! এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছ নি?"

হারুর মরণের খবরটা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে।

বলে, "লোক বড় ভালো ছিল গো। জগতে শত্তুর নেই।"

তারপর বলে, "ই বছর, জানো ঘোষ মশায়, অদেষ্ট সবার মন্দ। তিন বর্ষা নাবল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে।"

দিন নাই রাত্রি নাই, জলে স্থলে নবীনের কঠোর জীবনসংগ্রাম। দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুর অপমৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার সময় তাহার নাই।

অথচ এদিকে মমতাও জানে। দশ বছরের ছেলেটা বিকাল হইতে পুলের উপর ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। জলে নামিয়া বাপের মতো সেও মাছ ধরিতে চায়। কিন্তু নবীন কোনোমতে অনুমতি দিবে না।

"রেতে লয় বাপ, জ্বর হবে। কাল বিহানে আসিস।"

"বিহানে জল রইবে নি বাবা।"

"হুঁ, রইবে নি আবার। তোর ডুবজল হবে, জানিস।"

*

পুল পার হইয়া কিছুদূর অবধি রাস্তার দুপাশে শুধু চষা ক্ষেত। তারপর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে বসতি কম। রাস্তার দক্ষিণে ঝোপঝাড়ের বেষ্টনীর মধ্য পৃথক কয়েকটা ভাঙাচোরা